’শুভ্র ভালো হয়ে ওঠো’

ঈদের দিন সকালবেলাতেই কেন অনৈচ্ছিক কান্না দশকুল ছাপিয়ে এল, তা জানে না শুভ্র। নিশ্চই কোন আপাত জটিল রসায়ন কাজ করছে এর পেছনে। ঈদ অথবা না-ঈদ, এসব কি তার কাছে কোন আলাদা অর্থ বহন করে! প্রত্যেকটি দিনইতো নতুন নতুন সূর্য উপহার দেয়! কোনকিছুতেইতো আর কোনকিছু যায় আসে না!

শুভ্র’র একচিলতে মলিন ঘরের স্পষ্ট শব্দসীমার মধ্যেই পাঁচ পাঁচটি মসজিদ। প্রতিটি মসজিদ’ই বোধহয় অন্যগুলোর সঙ্গে নগ্ন প্রকাশ্য মাইক প্রতিযোগীতায় নেমেছে। বরিশালি টানে খুতবা দেয়া হুজুররা যেন বলতে চায় ‘শোননের সওয়াব না লইয়া যাইবেন কই!’ সম্প্রতি নির্মিত ঢিলছোড়া দূরত্বের মসজিদটি যেন এককাঠি সরেস, এখানে মিনারের চারদিকে মেশিনগানের মতো চারটি ডবল এক্সেল মাইকের মাঝে আরেকটি মাইক আকাশের দিকে ফিট করা; সম্ভবত এই মাইকের টার্গেট শ্রোতা খোদা সয়ং।

ঈদের দিন সকালে শুভ্র’র ঘুম চটে গেল ভুল লিরিকে এবং কর্কশ বেসুরো গলায় মসজিদের মাইকে ‘রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ‘ শুনে। হুজুরদের মধ্যে নিশ্চই আন্ত-মসজিদভিত্তিক ইগো কাজ করে, কারণ কিছুক্ষনের মধ্যেই ততোধিক বেসুরো আরেক মসজিদের হুজুর জাগতিক এবং মহাজাগতিক শ্রোতাদের বাধ্যতামূলক ‘রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ‘ শোনানো শুরু করলেন। এই হুজুর সম্ভবত জীবনে প্রথম মাইকে সম্পুর্ন গান গাওয়ার আনন্দে আপ্লুত। দেশীভাষা বরিশালি আর এপার ওপারের আন্তর্জাতিক ভাষা আরবি হুজুরের গলায় এমনভাবে সেট হয়ে গেছে যে নজরুল ইসলামের এই গানে তার স্থায়ি ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়।

শুভ্র অনেকটা আত্মরক্ষার তাগিদেই দরজা জানালা বন্ধ করে ফুল ভলিউমে মমতাজের জোরালো গলার গান ছেড়ে দেয়। মলিন জীর্ন এবং প্রাচীন চিলেকোঠায় ততোধিক প্রাচীন একটা ক্যাসেট প্লেয়ার তার দুই ঝরঝরে মাননীয় স্পীকার নিয়ে পুর্ণোদ্যমে হুজুরের রমজানের ঐ রোজার শেষে’র সাথে পাল্লা দিতে থাকে।

বালিশে মুখ চেপে গান শুনছিল শুভ্র। বুকটা কি একটু অকারণ থমথমে হয়ে আছে? অকারণ শব্দটাই বোধহয় ভুল। প্রতিটি ঘটনার পেছনে অনেকগুলো যৌগিক নিয়ামক কাজ করে। বুকের ভেতরে একটা বড় পাত্রে বোধহয় কান্নাগুলো শিশিরের মতো জমা হতে থাকে, নিজের অজান্তেই কখন যে পাত্রটি পুর্ন হয়ে যায় তা টের পাওয়া যায়না, তারপর একটু উথাল পাথাল অস্থিরতাতেই তা ছলাৎ ছলাৎ উপচে পড়তে থাকে।

ঝড়বৃষ্টি প্রায়শই যেমন গুড়ি গুড়ি শুরু হয়ে একসময় চারিদিক ঝাঁপিয়ে শুরু হয়, তেমনি হঠাৎ করেই শুভ্রর ভেতরে কি যেন হয়ে গেল। প্রথমে কয়েকবার কান্না তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে একসময় ঝাঁপি খুলে নেমে এলো। কোথায় লুকিয়ে ছিল এত কান্না ভেবে কূল পায়না সে। কান্না যেন তাকে ভেঙ্গেচুড়ে গলগল করে বেরিয়ে আসতে থাকে। সবকিছুই যেন অনেক গভীর কোথাও থেকে উঠে আসছিল। যেন তার ভেতরে গভীর একটা পাতকুয়ো আছে, যেখানে উপর থেকে ঢিল ছুড়লে একজীবন পরে টুপ করে নিঃসজ্ঞা শব্দ হয়। অথবা যেন তার ভেতরে একটি অতলান্ত সমুদ্র আছে, যার গভীর থেকে কান্নার বুদবুদ ঝাঁকি দিয়ে প্রবল পরাক্রমে বড় হতে হতে উপরে উঠে আসছে।

ঝড় থেমে যাবার মতো একসময় ধীরে ধীরে শুভ্র স্বাভাবিক হয়। ঝড়ের ছাপ তার প্রতিটি রোমকুপসহ ভেতরের তন্ত্রে তন্ত্রে। শরীরটাও হঠাৎ করেই দুর্বল লাগছে। চোখগুলো নিশ্চই এতক্ষনে রক্তজবার মতো টকটকে লাল হয়ে আছে। নোনাপানি হয়ত শেষের দিকে রক্ত হয়ে ঝরে পড়ছিল।

শুভ্র নিজের চুলে হাত বুলিয়ে একটু বাতাস খুজে চোখ বন্ধ করে কিছুটা শান্ত হবার চেষ্টা করল। সে নিজেও কিছুটা অবাক হয়েছে। হঠাৎ করে কূল ভাসিয়ে এমন কান্না কেন আসবে! উচ্চাকাঙ্খা তার

কখনোই ছিলোনা। ছোট্ট সৎ নির্ঝঞ্ঝাট জীবিকা, ইচ্ছে করে কাধে নেয়া শখের ব্যস্ততা, বন্ধু নামের বন্ধুরা আর একটু দূরে থাকা আত্মীয়স্বজন কি যেকোন কান্নাকে পাথরচাপা দিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়!

হঠাৎ এই কান্নাস্রোতের কোন কার্যত কারণ শুভ্র খুঁজে পায় না। সমসাময়িক গ্লানি, অপুরনীয় অপুর্ণতা, অক্ষম ব্যর্থতা এবং দৈন্য'তো সামাজিক জীবনকে যাপন করার'ই অংশ। শুধু এসব'ই নয়, দেশের নিরাশাজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নাগরিক অসহায়ত্ব, অনিশ্চিত দৈনন্দিন জীবনসহ সকল প্রতিকুলতাও তাকে নিরন্তর হতাশাগ্রস্থ করে।

এটা ঠিক যে শুভ্র ক্লান্ত, ভীষণই ক্লান্ত। মরণসমান লম্বা দৌড়ে তার প্রতিটি অঙ্গ কেঁদে কেঁদে বিশ্রাম চাইছে। শরীরের প্রতিটি পেশী অতি ব্যবহারে শক্ত পাথর হয়ে গেছে, হাড়গুলো হয়েছে শুকনো আর ভঙ্গুর, যেন আর সামান্য চাপেই সব গুড়ো হয়ে ভেঙ্গে যাবে। ঘাম ঝরে ঝরে তার গায়ে স্থায়ী থকথকে কাদার পরত জমেছে। শুভ্রর এখন প্রায়'ই মনে হয় একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে সে কখনোই আর উঠে দাড়াতে পারবে না, মাটিতে পড়ে পড়েই না-ভাঙ্গা ঘুম ঘুমাবে।

ঘটনাটা ভাবতে চায়না শুভ্র, তবুও নিয়তির মতো বছরখানেক আগের দিনগুলো ভেসে আসে। সেদিন কেন যে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময়ে অন্ধকার নির্জন রাস্তাটি বেছে নিয়েছিল, তা নিয়ে এখনো বিভ্রান্ত হয় সে। অবশ্য অন্ধকার নির্জন রাস্তা প্রভাবক হিসাবে কাজ করলেও প্রভাবকবিহীন অবস্থায় একটু দেরিতে হলেও ঘটনাটি ঘটতো; এ কারণেই ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা বলতে আপত্তি আছে তার।

অনেকক্ষণ থেকেই শুভ্র খেয়াল করছিল যে দুজন মানুষ তার পিছু নিয়েছে। অন্ধকারে শুধুমাত্র তাদের অবয়ব বোঝা যাচ্ছিল। শুভ্র দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ এবং আশংকাগ্রস্থ হলেও এই ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছিল যে তার সাথে বেশকিছু অর্থকড়ি থাকলেও তেমন কিছুই নেই যা কেড়ে নিলে তার অপুরণীয় ক্ষতি হতে পারে। রাস্তাটি যতদূর চোখ যায় জনমানবশুন্য, তাই তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে বা'দিকের একটি গলিতে ঢুকে পড়ে সে, মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে গলিটিতে অন্তত কিছু মানুষ থাকবে অথবা হঠাৎ দৌড়ে সে কোন আলকিত রাস্তায় উঠে যেতে পারবে।

বিধি বাম! গলিতে ঢুকে শুভ্র দেখতে পায় এটি তাকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না, কারণ নিয়তির মত গলিটি হঠাৎ করেই নিষ্ঠুরভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে। বিকল্প পথ খোঁজার চেষ্টার মধ্যেই শুভ্র দেখে তাকে অনুসরনকারী দুজন গলির মুখে এসে দাড়িয়েছে। দুজনের মুখই কালো কাপড়ে ঢাকা, একজনের হাতে মাছের পেটের মত ঝিলিক মারছে একটি ধারালো লম্বা দেশী ছুরি। এগুলোকেই বোধহয় কিরিচ বলে।

তীব্র আতঙ্কে দিশাহারা হলেও কোন পুর্বনির্ধারিত হিসাবেই বোধহয় শুভ্র তার আপাত মুল্যবান অর্থকড়ি হাতে নেয়, এগুলোর বিনিময়েই হয়ত আততায়ীদের পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া যাবে। মানিব্যাগটি খুব প্রিয় ছিল তার। প্রিয়বন্ধুর উপহার দেয়া সুন্দর জিনিষটার সাথে অনেক টকঝাল স্মৃতিও জড়িয়ে ছিল।

সবকিছু হাতে বাড়িয়ে ধরে যখন পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাচ্ছিল শুভ্র, ঠিক তখনি কিরিচ হাতের জন পেছন থেকে তার সার্ট ধরে হ্যাচকা টানে বেসামাল করে ফেলে। সাথে সাথে মুখঢাকা অপরজন পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরে। কিরিচধারী শুভ্রকে ভীষণ আতঙ্কিত করে আঘাত করার জন্য অস্ত্রটি মাথার উপর তুলতেই সহজাত প্রবৃত্তিতে সে তার মুখের নোংরা মুখঢাকা কাপরটি টেনে খুলে ফেলে। তীব্র বিস্ময়ে হুভ্র হতবাক হয়ে যায়। নিজের চোখকেই সে প্রথমে অবিশ্বাস করে। সে কিভাবে মেনে নেবে তারই প্রিয়বন্ধু তাকে খুন করতে চাচ্ছে! এই খুনের পরিকল্পনা নিশ্চই সে দীর্ঘদিন ধরে করেছে আর পরিকল্পনামতই শুভ্রর সাথে প্রতিদিন হাসিমুখে ভালোমানুষির ভান করেছে।

শুভ্র বিস্ফোরিত চোখে দেখে তার প্রিয়বন্ধুর মুখের কাপরটি খুলে যাওয়ায় সে ভীষণ রেগে গেল। খারাপ একটি গালি দিয়ে ধারালো কিরিচটি অবলীলায় তার পেটে ঢুকিয়ে দিল। পুরো প্রক্রিয়াটি যেন শুভ্র অনেকক্ষণ ধরে দেখল, কিরিচের সুচাল ডগাটি প্রথমে তার সার্টে ছোট্ট একটি পথ করে পেটের চামরায় চুমু খায়, একটু বোধহয় থমকে দাড়ায় চামরার মুখমুখি। তারপর হঠাৎ বেগে কালচে ইস্পাতের টুকরোটি পেটের চামরা, চর্বির স্তর, পেশী ভেদ করে আরো অনেক ভেতরে ঢুকে যায়।

প্রথম ধাক্কায় শুভ্র কোন ব্যথা অনুভব করে না। নিজের ভেতরের যে প্রত্যঙ্গগুলোকে সে স্পর্শ করতে পারত না, যাদেরকে স্পর্শ করলে কেমন অনুভূতি হয় জানত না, সেই অনুভূতিগুলো জীবনে প্রথম পাচ্ছিল সে। কালচে ইস্পাতের টুকরোটিকে তার শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে হচ্ছিল তার। একবুক অবিশ্বাসে সে নিজের নিজের ক্ষতের দিকে তাকানোর পর তাকায় প্রিয়বন্ধুর দিকে, বন্ধুটির নিশ্চই বেশ কষ্ট এবং পরিশ্রম হচ্ছে তার দীর্ঘ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে। সহকারীটি শুভ্রর হাত পেছন থেকে মুচরে ধরে কিরিচধারীকে তাড়া দেয় বিচলিত না হয়ে দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য। বন্ধুটি দাঁতে দাঁত চেপে কিরিচটি টেনে বের করতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে তার মুখে ছিটকে পড়ে। শুভ্র অসহ্য ব্যথায় ছটফট করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে বন্ধুটি রখমাখা মুখটিকে ভয়ঙ্কর বিকৃত করে আবার কিরিচটি তার পেটে ঢুকিয়ে দেয়। ধস্তাধস্তিতে পেছনের সহকারীটির মুখঢাকা কাপরও একসময় খুলে যায়, সহকারিটি শুভ্রর হাত আরো জোরে মুচরে ধরে চেঁচিয়ে কিরিচধারীকে কিরিচটি পোঁচিয়ে উপর দিকে তুলতে বলে। কিরিচের হাতল নীচে নামিয়ে উপরদিকে ঠেলে হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দেয়া যায়, এই মহামুল্যবান তথ্যটি সে সঠিক সময়ে উত্তেজিত ভঙ্গীতে জানায়। মরণব্যাথায় শুভ্র যত ছটফট করে কিরিচধারী বন্ধুটি ততই তাকে অন্ধের মত কোপাতে থাকে। শুভ্রের ভেতর থেকে এবার রক্তের সাথে গোলাপী এবং নীলাভ মাংসের টুকরো প্রতি কোপের সাথে বেরিয়ে আসতে থাকে। শুভ্রর খুব ঘুম পায়, ঘুমে তার দুচোখ বন্ধ হয়ে আসতে চায়। ঘুমানোর মুহুর্তে সে এই ভেবে অবাক হয় যে মানুষের ভেতরে এত রক্ত থাকে তার জানা ছিল না।

দীর্ঘ একবছর পর আবার সবকিছু মনে পরে শুভ্রর। নিজের গেঞ্জী উচু করে ক্ষতস্থানে হাত রাখে সে। প্রতিটি দাগের উপর দিয়ে আলতো করে হাত বুলায়। পারিপার্শিকতা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়, নিরন্তর নির্বাসিত করে, তবুও সে আদর করে নিজের ক্ষতে আর ফিসফিস করে বলে ‘ভালো হয়ে ওঠো’।